প্রথায় আবদ্ধ আমাদের সমাজ

তাসরীনা শিখা

আমার বোন ছাত্রজীবনে যুক্তরাষ্ট্রে এসে বসবাস শুরু করে এখন জীবনের মধ্যাহ্ন সূর্যটাও প্রায় অতিক্রম করে ফেলেছেন। কয়েক সপ্তাহ হলো দেশ থেকে কোরবানী ঈদ করে ফিরে এসেছেন। বহু বছর পর ছেলে মেয়ে স্বামী সবাই মিলে দেশে ঈদ করতে যাচ্ছে সে ব্যাপারে তার আনন্দ উত্তেজনার শেষ ছিল না। আর আমি হচ্ছিলাম ঈর্ষান্বিত। কারন আমি যেতে পারছি না। এখান থেকেতো ইচ্ছে হলেই দেশে যাওয়া সম্ভব নয়। ছুটি ছাটা আর্থিক ব্যাপার সব মিলিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বোন ফিরে আসার পর আমি বহু উত্তেজনা নিয়ে ওকে ফোন করলাম। কেমন ঈদ হল, কার কার সাথে দেখা হল, দেশের পরিস্থিতি, ভুণা মাংস, ঝুরা মাংস কেমন খাওয়া হল ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন। আমারো হাজারো প্রশ্নের জবাবে বোন দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিল, অন্যান্য সবকিছুই ঠিক ছিল, কিন্তু তার ছেলেমেয়েরা মানসিকভাবে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। যার ফলে তাদের নিয়ে সেরকম আনন্দ করা সম্ভব হয়নি। আমার বোনের কাছে বিস্তারিত ঘটনা শুনে সারমর্ম যেটা পেলাম সেটা হল কোরবানীর গরুকে ধরে বেঁধে জবাই করাটা তাদের কাছে অত্যন্ত নির্মম একটা ব্যাপার বলে মনে হয়েছে। তাদের ধারনা কোরবানীর নামে বাংলাদেশের মানুষ নির্মমভাবে পশু হত্যা করছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে কারো বাড়ীর গ্যারাজ, কারো উঠোন, এলাকার রাস্তাগুলো রক্তে ও গন্ধে ভরে যাচ্ছে। বোনের ছেলেমেয়েরা এদৃশ্য দেখার পর আর কোরবানীর মাংস খেতে পারেনি। এখানে যে তারা সব্জী ভোজী তা নয়, কিন্তু এখানে তারা মাংস কিনে খাচ্ছে বাজার থেকে। কাজেই স্লোটার হাউজে কি ঘটছে সেটাতো তারা আর চোখে দেখছে না। এসব
চিন্তা করে আমার বোন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোরবানী ঈদে আর দেশে যাবে না, ছেলেমেয়ে নিয়েতো নয়ই, একাও নয়। আমার বোনের দুঃখেও আমিও দুঃখিত হলাম, এবং কোরবানীর নামে যে লাখ লাখ গোসম্পদ দেশে ধ্বংস করা হচ্ছে এটা একবারেই সমীচিন নয় সে ব্যাপারে তাকে সমর্থন করলাম। তারপর নিজের মনে মনেই বললাম, আপা গরু হত্যা দেখে সিদ্ধান্ত নিলে আর কোরবানী ঈদে দেশে যাবে না। বাংলাদেশের কত শত মানুষ যে প্রতিবছর নানাভাবে হত্যা হচ্ছে সে খবর কি তোমরা রাখো? সে দৃশ্য দেখলে কোরবানী ঈদ কেন তোমার ছেলেমেয়েরা কোনদিনই দেশে যেতে চাইবে না।

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার কাছে কোরবানীর ঈদটি ভয়ংকর মনে হতো। কারন যে গরুটি বাড়ীতে কিনে আনা হতো কোরবানীর জন্য আমরা ভাইবোনেরা কত যত্ন করেই না তাকে

খাওয়াতাম, আদর যত্ন করতাম, ঈদের আগে যে কয়দিন সময় আমরা পেতাম। ঈদের আগের দিন দেখতাম গরুর চোখ দিয়ে পানি পড়ে। জানিনা এ অবলা প্রানিটি কি অনুভব করতে পারতো পরদিন তার জীবনের যবনিকা ঘটবে। হয়ত পারত, তা না হলে সে কাঁদতো কেন? কোরবানীর আগে আমরা জড়ো হয়ে দাড়াতাম গরু জবাই দেখার জন্য। কিন্তু যখনই গরুটিকে কয়েকজন মিলে বেঁধে ধরে রাখতো আর মৌলভী সাহেব তার গলায় ছুরি চালাতেন তখন আমি ভয়ে বিকট চিৎকার করে উঠতাম। আমার বাবা আমার চোখ হাত দিয়ে ঢেকে ছুটে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে আসতেন। যতদিন ছোট ছিলাম প্রতি বছর আমি একই ঘটনা ঘটাতাম। আর বড় হয়ে আমি কখনো কোরবানী দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করিনি। জানিনা কেন এ ধর্মীয় প্রথাটি সব সময় আমার কাছে মনে হতো নৃশংস পশু হত্যা। আমার এ অনুভূতিটুকু মাকে কেঁদে কেঁদে প্রকাশ করতে যেয়ে প্রথম বকুনই খেয়েছিলাম। পরে মা আমাকে বুঝিয়েছিলেন ধর্মীয় ব্যাপারে কখনো এধরনের মন্তব্য করতে হয় না। সে থেকে আমি এ বিষয়ে কোন কথা কোনদিন বলিনি, বলতে ভয় পেয়েছি। আজও বলি না আজও ভয় পাই। সামাজিক প্রথা নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। কিন্তু ধর্মীয় প্রথা নিয়ে কথা বললে বিরাট ঝুকি, বিরাট বিপদের সম্মুখীন হতে হয় সবাইকে। কারন ধর্মে কোন যুক্তি তর্ক নেই।

এ টি এন বাংলায় যখন এবার কোরবানীর দৃশ্য বারবার বহুবার দেখানো হচ্ছিল গরুটি ছুটে চলে যেতে চাচ্ছে, তাকে ধরে এনে বেঁধে জবাই করা হচ্ছে, চামড়া ছিলা হচ্ছে, আর সব মানুষরা জড়ো হয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করছে। এত বছর পর আবারো আমার ছোট বেলার সে অনুভূতিটুকু গ্রাস করছিল। আমার মনে কোথায় কোন কমল স্থান থেকে বেড়িয়ে এসেছিল 'এ নৃশংস পশু হত্যা'। মনে হওয়ার সাথে সাথেই কথাটাকে মন থেকে দুর করে দেবার চেষ্টা করেছি, কারন এটা ধর্মীয় ব্যাপার এটা নিয়ে কোন মন্তব্য করতে চাইনা বা কোন সংশয় মনে স্থান দিতে চাই না।

মধ্যপ্রাচ্যে বহুদিন থাকার সুবাদে দেখেছি কোরবানীর ঘটনাটির সুত্রপাত মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু হলেও আরবরা প্রতি বছর কোরবানী দেয় না। তারা কোরবানী দেয় তারা যখন হজ্জে যায়। অথচ আমরা দক্ষিন এশীয় মুসলমানরা প্রতি বছরই কোরবানী দিয়ে থাকি। এটি একটি ধর্মীয় প্রথায় পরিনত হয়েছে। আর ধর্মীয় নির্দেশ ও প্রথাটি এখন শুধু প্রথায় সীমাবদ্ধ নেই, এটা ধনীদের মাঝে দাড়িয়েছে প্রতিযোগিতায়। মধ্য বিত্তরা কষ্ট করে হলেও কোরবানী দেন শত শত বৎসর যাবৎ প্রচলিত ধর্মীয় প্রথাকে বজায় রাখতে। আর ধনীরা কোরবানী দিয়ে থাকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করতে। এই প্রতিযোগিতায় যে ধনী ব্যক্তিটি যত দামী গরুটি কোরবানী দেবে সে ধনীত্ব ততবেশী প্রমান করতে পারবে। এই ধনী ব্যক্তিবর্গ কোরবানীর প্রতিযোগিতায় যে পরিমান টাকা খরচ করেন সে টাকা দিয়ে বাংলাদেশের একটি দরিদ্র পরিবার সারাবছর খেয়ে পরে বাঁচতে পারে। অনেককেই গল্প করতে শুনি তার এই নিকট আত্মীয় তিনটা গরু চারটা খাসী ইত্যদি নানারকম সংখ্যার গরু

খাশী কোরবানী দিয়েছে। তাদের কথায় দীর্ঘশ্বাস ফেলি হায়রে মানুষ, ধর্মের নির্দেশ বা প্রথা যেটাই হোক সেটা পালনের জন্য কি এতগুলি গরু খাশী নিধনের প্রয়োজন আছে? একি ধর্ম নাকি এটা তাদের নাম ও প্রাচুর্যকে বিকশিত করার একটি পদ্ধতি?
কোরবানীর অর্থ তুমি আল্লাহর নামে প্রিয় কিছু বির্সর্জণ দাও। সে বিসর্জন অর্থও হতে পারে। সমপরিমাণ অর্থ যদি আমরা বিলিয়ে দিতে পারি বাংলাদেশের সে সব দরিদ্র জনসাধারনের মাঝে, যারা ঈদের আনন্দ কখনো উপভোগ কাকে বলে জানে না। তারা যদি সে অর্থ দিয়ে অন্ততঃ ঈদের দিনটিতে নুতন জামা কাপড় পরে পোলাও কোর্মা খেতে পারে সেটাও কি কম তৃপ্তির ও খুশীর নয়? ধনী লোকেরা কোরবানীর একটি বিরাট অংশ পাঠান এক নিকট আত্নীয়ের বাড়ীতে, আর একটি বিরাট অংশ পাঠান অন্য আরেক নিকটজনের বাড়ীতে। ঠিক সমপরিমান অংশ তার বাড়ীতেও আসে অন্য পক্ষ থেকে। ডিপফ্রিজ ভরে যায় কোরবানীর মাংসে। একমাস ধরে চলে ভুনা মাংস ঝুরা মাংস খাবার পালা। নাহ ভিখারীরা যে বঞ্চিত হয় মাংস প্রাপ্তি থেকে তা নয়। ঈদের দিনটিতে ভিখিরী ভিখিরীই থাকে। তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না। সেদিনও তারা ঘুরে ঘুরে মাংস সংগ্রহ করে। কিন্তু তারা এত মাংস রাখবে কোথায়। তাদের ঘরে কি ধনীদের মত ফ্রিজ আছে? তারা বিক্রি করে দেয় মাংস রেষ্টুরেন্টগুলোতে। কারন তাদের প্রয়োজন পয়সার। যা দিয়ে তারা কিছুদিন খাবার কিনে খেতে পাররে। তাহলে ঈদেও দিনটিতে কি আমরা এই দরিদ্র ভিখারিদের ভিক্ষাবিণ্ডি থেকে মুক্তি দিতে পারিনা তাদের মাঝে কোরবানীর পয়সাটা বিলিয়ে দিয়ে?

কোন প্রজ্ঞাবান প্রগতিশীল ব্যক্তি যদি বলেন , শত শত বৎসর আগে হযরত ইব্রাহীম(রাঃ) আল্লার নির্দেশ পালন করার জন্য এবং আল্লার প্রতি ভালবাসার প্রতিক হিসাবে নিজের ছেলের কোরবানী দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। শেষাবধি আল্লার প্রদত্ত একটি দুম্বা তিনি আল্লার নির্দেশে কোরবানী দিয়েছিলেন। এই ঘটনা আমরা সব মুসলমানরাই জানি। সেটা ছিল ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার এবং ঈশ্বরের নির্দেশ পালনের একটি নির্দশন। কিন্তু এই নির্দশন অনুসরন করতে যেয়ে আমাদের মত কৃষিভিত্তিক দরিদ্র দেশে প্রতিবছর প্রতিযোগিতা মুলকভাবে যে রকম লাখ লাখ গোসম্স্লদ নিধন করা হচ্ছে তার কি কোন যুক্তি সঙ্গত কারন আছে? গো সম্স্লদ বাঁচিয়ে রাখা আমাদের দেশে অত্যান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কথাগুলো কতটুকু গ্রহনীয় হবে আমাদের সমাজে? বিশেষ করে এখন যখন মৌলবাদীরা হিংস্র ও
প্রচন্ড শক্তিশালী রূপ রাখছে বাংলাদেশে ও সারা বিশ্বে।

১৯৯২সালে তসলিমা নাসরিন লজ্জা বইটি প্রকাশের পর মৌলবাদীরা যে ভাবে ক্ষিপ্ত হয়েছিল যার ফলে তসলিমা নাসরিনকে দেশছাড়া হতে হয়েছে। অথচ লজ্জা বইটিতে ধর্মকে আক্রমন করা

হয়নি, এটা ছিল একটি সাধারন উপন্যাস। সরকারও মৌলবাদীদের ভয়ে বইটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। সরকারের যুক্তি ছিল বইটি বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করবে। এখন সরকার কি বলবেন? তারা কি বলবে বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে পরিনত হয়ে গেছে? তসলিমা নাসরীন মৌলবাদীদের জন্য বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হারালেও গোলাম আযমের মত মানুষরা ভয়ানক অন্যায় করে, রাষ্ট্রদ্রোহিতা করেও নাগরিকত্ব বজায় রাখতে পেরেছে এবং আরাম আয়েশে জীবন যাপন করছে। সে তুলনায় তসলিমাতো কোন অপরাধই করেনি। তিনি একজন লেখক, চিন্তার প্রকাশতো কোন অপরাধ হতে পারে না। হুমায়ন আজাদও তার লেখনীতে সরাসরি ধর্মকে আক্রমন করেননি, তিনি আক্রমন করেছিলেন মৌলবাদীদের। প্রতিবাদ করেছিলেন ধর্মের নামে অধর্মের। তিনি তার লেখনী ধরেছিলেন অযৌক্তিক প্রথার বিরুদ্ধে, যার ফলে মৌলবাদীদের কারনে তার প্রান দিতে হল। আমাদের দেশ এমন একটি দেশ যে দেশে লেখক তার লেখনীতে স্বাধীনতা আনতে পারে না। তার অনুভূতি ও ভাবনাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা তাদের নেই। বহু ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত রয়েছে, যা আমরা নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকি। যার অনেকগুলোর পিছনে হয়ত কোন যুক্তি নেই।

অনেক ভাবনাইতো মানুষের মনে আসে, অনেক ইচ্ছাই মানুষের মনে বাসা বাঁধে। অনেক কল্পনাই মানুষের মাঝে প্রগতির উজ্জল আলো জ্বেলে তোলে। তার কতটুকু মানুষ প্রকাশ করতে পারে। সব কথা, সব অনুভূতি প্রকাশ করার স্বাধীনতা এবং সাহস কোনটাই আমাদের নেই। আমাদের অনুভূতি, আমাদের ইচ্ছা, আমাদের যুক্তিগুলোকে বিনা দ্বিধায় মুক্তভাবে আলোচনা করার বা লেখার স্বাধীনতা কি আমাদের দেশের জনসাধারনের ও লেখকদের কখনো হবে? না কি আমরা আধুনিক পৃথিবীতে ও স্বাধীন দেশে বসবাস করেও বাকরুদ্ধ হয়ে ভয়ের শিকলে বন্ধী হয়ে থাকবো?

তাসরীনা শিখা ঃ টরন্টো প্রবাসী লেখক